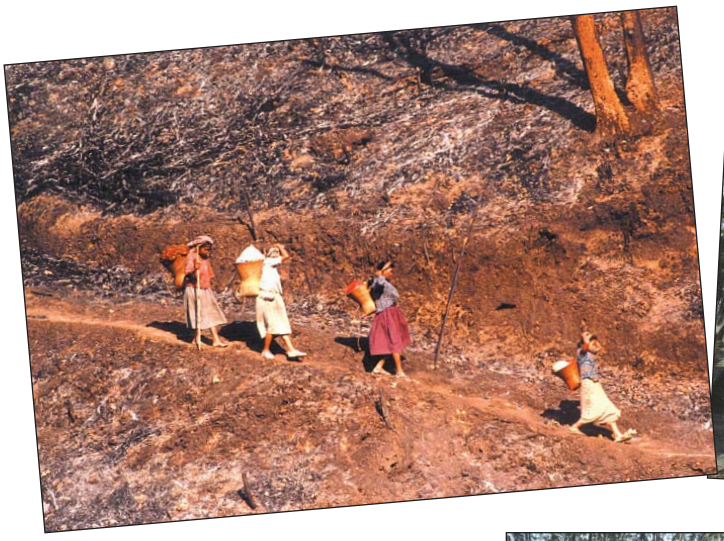

ছুটিতে বেড়ানো

বেড়াতে যাব... কিন্তু কোথায়? দেশের পর্যটকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন আসে। আমাদের দেশে যাবার মত অনেক জায়গা আছে কিন্তু নেই পরিচর্যা। আছে পর্যটন কর্পোরেশন, নেই কার্যকারিতা। ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ এমন কয়েকটি স্পট তুলে এনেছে, যেখানে সামান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা গেলে আপনি ঘুরে আসতে পারেন আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে। উপভোগ করতে পারেন দৃষ্টিনন্দন বাংলাদেশকে...

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

১৯৯৯ সাল। দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ানো এক অতি উৎসাহী দল ঢাকা থেকে বান্দরবানের উদ্দেশে রওনা হলো। কেওকারাডং পাহাড়ের চূড়া তাদের লক্ষ্য। বান্দরবান থেকে নৌকায় রুমা বাজার। সেখান থেকে ২ দিনের হাঁটা পথ। ৩/৪ মাইল পরপর পাহাড়িদের গুচ্ছগ্রাম, তাদের বিশ্রামের স্থান আর রাত কাটাবার অবলম্বন। এভাবেই ঘুরে এলো কেওকারাডংয়ের চূড়া, এ নিয়ে পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হলো। পরবর্তী বছর থেকে আরো অনেকে গেলেন কেওকারাডংয়ে। বাংলাদেশে পর্যটন স্পট হিসেবে পরিচিতি পেল কেওকারাডং। এখন প্রতি বছর সেখানে প্রচুর টুরিস্ট যায়। এই টুরিস্টদের ভিত্তি করে বান্দরবান থেকে কেওকারাডং পর্যন্ত দীর্ঘ পথে এখন গড়ে উঠেছে কয়েকটি রেস্ট হাউজ, রাত কাটানোর হোটেল।

বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে বাংলাদেশ নেই। পর্যটকরা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে চলে যায় ভারত থেকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড বা নেপাল, এমনকি এখন বার্মাতেও যাচ্ছে। একান্ত প্রয়োজন না হলে বিদেশীরা বাংলাদেশে আসতে চায় না। কেন এমন হলো? এখন আইটি এন্টারটেইনমেন্টের পরেই পর্যটন ব্যবসা। কিন্তু বাংলাদেশ কোনোটিতে এগুতে পারছে না।

গারো পাহাড় এলাকার মান্দি পরিবার

বাংলাদেশের পর্যটন বিষয়টি চিন্তা করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। কিন্তু এই সমুদ্র সৈকতের পর পর্যটন স্পট হিসেবে আর কোনো স্থানই মনে পড়ে না। কেননা, এ দেশের আর কোনো স্থান পর্যটকদের জন্য এখনও গড়ে ওঠেনি। কেউ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেনি। তাছাড়া পর্যটন স্পট হিসেবে দেশের যে আরও বিভিন্ন এলাকা রয়েছে তা দেশের মানুষ এখনও জানে না। এ দেশের পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা যায় এমন কিছু স্থান চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছে সাপ্তাহিক ২০০০ । এই স্থান গুলো এতোই আকর্ষণীয় যে, এখানে পর্যটন গড়ে তোলা হলে তা দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। বদলে যাবে এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা।

এটাই সুযোগ। কারণ গত ৩০ বছরে পৃথিবীতে ট্যুরিজমের ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দামী দামী শহরে ঘোরা আর দামী হোটেলে রাত কাটানোর সংস্কৃতি বদলে গেছে। এখন টুরিস্টরা দুটি দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একটি হলো প্রকৃতি দর্শন, অন্যটি ইকো ট্যুরিজম। গাছ পালা, বন্য প্রাণী দেখতে বনে-বাদাড়ে বেড়ানোকে ট্যুরিস্টরা এখন প্রাধান্য দিচ্ছে। অন্যদিকে অপরিচিত গোত্রীয় সংস্কৃতির প্রতি ট্যুরিস্টদের আগ্রহ বাড়ছে ব্যাপক হারে। সাংস্কৃতিক জীবন বৈচিত্র্য সম্পর্কে মানুষ জানতে চায়। আর এ কারণেই আফ্রিকা এবং এশিয়ার প্রতি নজর বাড়ছে ট্যুরিস্টদের। আর ট্যুরিজমে পুরাকৃর্তি দর্শনের পুরনো কালচারটির প্রতি এখনও ট্যুরিস্টদের আগ্রহ শেষ হয়নি। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসা ট্যুরিস্ট স্পটগুলো বদলে দিতে পারে এদেশের পর্যটনের অবকাঠামোকে। এখানেও গড়ে উঠতে পারে ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি।

বাংলাদেশে রয়েছে হাওর এলাকা ও পাহাড়ি লেক, নদী। হিমালয়ের বৃহৎ তিনটি নদীর অববাহিকা এই বদ্বীপ। যাকে বলা হয় বৃহত্তম বদ্বীপ। পানিই হতে পারে বাংলাদেশের মূল আকর্ষণ।

বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রোকোনা জেলাগুলোতে রয়েছে

বেয়ে চলা মাধবকুন্ড ঝর্না

বেশকিছু ছোট-বড় হাওর। বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলের পানিতে বর্ষাকালে হাওরগুলোকে সমুদ্রের মতো মনে হয়। বর্ষাকালে এই হাওরগুলো পানিতে ভরে যায়, পাওয়া যায় নানা ধরনের মাছ। ঠিক তেমনি শীতকালে হাওরগুলো দেশী-বিদেশী পাখির আগমনে মুখর হয়ে ওঠে। এই হাওরগুলোকে কেন্দ্র করে এ দেশে সারা বছর চলতে পারে হাওরভিত্তিক পর্যটন।

হাওর নিয়ে আলোচনার প্রথমেই আসে সুনামগঞ্জ জেলার নাম। জেলাটিতে শুধু বড় হাওরের সংখ্যা ৫২টি। এগুলোর মধ্যে টাংগুয়ার হাওর, শনির হাওর, মাটিরান হাওর, দেখার হাওর, নলুয়ার হাওর, ধান কুনিয়া হাওর ইত্যাদি।

টাংগুয়ার হাওরকে রামসার এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত। এই হাওরটি এ দেশে মাদার ফিসারিজ হিসেবে পারিচিত। সাড়ে ৯ হাজার একরে অপরূপ সুন্দর হাওরটি বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, মাছ আর জলজ উদ্ভিদের আবাসস্থল।

সুনামগঞ্জের এই হাওরগুলোতে শীতের শুরুতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আসতে শুরু করে। জলমহালগুলোতে শুরু হয় মাছ ধরা। বিভিন্ন এলাকায় বসে গ্রামীণ মেলা। এসব মেলায় অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে থাকে হাসন রাজা, রাধারমন দত্ত, দুরবীশাহ, আব্দুল করিমের গানের পালা।

বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলায় রয়েছে হাকালুকি হাওর, এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং দেশের সবচেয়ে বড় হাওর এটি। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া ও বড়লেখা, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ১৮ হাজার হেক্টর আয়তনের এই হাকালুকি হাওর। এই হাওড়ের পূর্বে পাথারিয়া ও মাধব এবং পশ্চিমে ভাটেরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকায় রয়েছে জলজ তৃণ এবং জলাময় বনভূমি। এসবের ওপর নির্ভর করে এখানে রয়েছে নানা জাতের প্রাণী। প্রায় ১৫০ প্রজাতির অভিবাসী জলচর পাখি নিয়ে এখানে রয়েছে পাখিদের একটি অভয়াশ্রম। মৎস্য খনি হিসেবে পরিচিত এই হাওর এক সময় সারা সিলেট বিভাগের মাছের চাহিদা মেটাতো। এই হাওড়ে রয়েছে কালি বাউশ, আইড়, বাঁশপাতা, কাজলী, খোলসা, তারাবাইন প্রভৃতি নানা জাতের

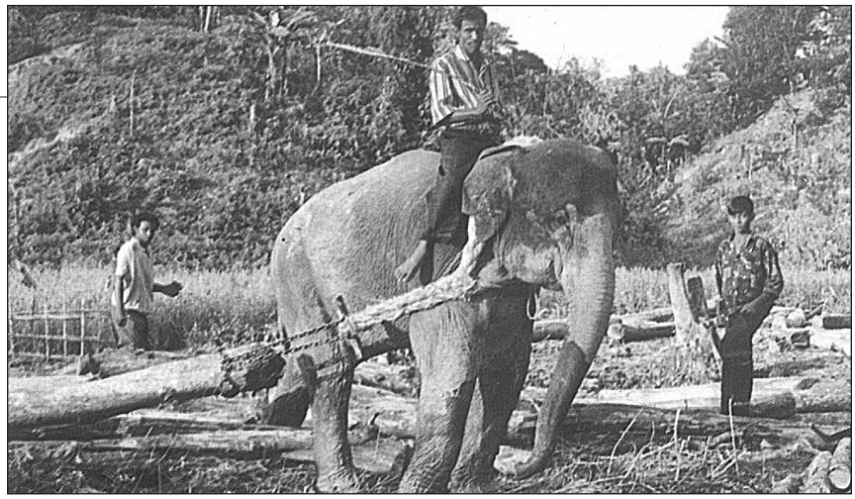

রাঙ্গামাটির স্থানীয়দের সাহায্যকারী হাতি

ছোট-বড় মাছ। শীতকালে এই হাওর ভরে ওঠে নানা জাতের পরিব্রাজক পাখির কলকাকলীতে।

এই হাওরগুলো দেশের মানুষের কাছেই অচেনা। অথচ পরিকল্পনা করলে এটা হতে পারে ট্যুরিস্ট কেন্দ্র। এই হাওরগুলোতে ট্যুরিস্টদের ৩-৪ দিনের জন্য বেড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বেড়ানোর জন্য বিশাল সাইজের হাউজবোটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই হাউজবোটের ভেতরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে আরামদায়ক শোবার কক্ষ- যার জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যাবে। যেমন ছিল কাশ্মীরে। হাওরে বেড়ানোর জন্য সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা হলে দেশী পর্যটকের চাইতে বিদেশী পর্যটক বেশি আকৃষ্ট হবে। ৫-৬ দিনের জন্য ট্যুরিস্টরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারেন। মোহনগঞ্জ থেকে তাদের যাত্রা শুরু হতে পারে। এখান থেকে তারা যেতে পারের কিশোরগঞ্জ, ইটনা, কুলিয়ারচরের দিকে। নৌকা নিয়ে চলে যাওয়া যাবে সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, জামালগঞ্জ, পাগলা, দিরাই, টেকেরহাট, ভারতীয় বর্ডারের কাছাকাছি। টেকেরহাটের এই বর্ডার এলাকাটি খুবই সুন্দর। যাওয়া যাবে তাহেরপুর। মোহনগঞ্জ থেকে উত্তরে যত দূরে যাওয়া যাবে ততই জনশূন্য হয়ে পড়বে হাওর এলাকা। কয়েক মাইল এগুলে চারদিকে কোনো তীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মনে হবে সাগরের মধ্যে ভেসে চলছে নৌকা। ৪/৫ ঘন্টা পর পর হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটি ছোট্ট গ্রাম। দূর থেকে মনে হবে গ্রামটি সাগরের ওপর ভাসছে।

বান্দরবান এলাকার বোমা আদিবাসী জীবন

এই হাওরে দেখা যাবে জেলেদের মাছ ধরার দৃশ্য। বর্ষায় এই হাওর ভরে ওঠে মাছে। শিং, কৈ, মাগুর, টেংরা মাছে ভরে যায় হাওরগুলো। দীর্ঘ সময় পর পর দেখা যাবে উপজেলা শহর। সেখানের রেস্তোরাঁয় হাওরের এসব সুস্বাদু মাছ পরিবেশিত হয়।

এ দেশের হাওরগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো তার বিশালতা। সেই বিশালতার মাঝে নিস্তব্ধতা মানুষের মনকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যায়। তাছাড়া রঙ-বেরঙের পাখির উপস্থিতি আপনাকে নিয়ে যাবে প্রকৃতির একেবারে ভেতরে।

আমাদের এই হাওরগুলো বর্তমানে দেশী পর্যটকদের চাইতে বিদেশী পর্যটকদের নজর কেড়েছে। হাওরে নৌকা নিয়ে বেড়ানোর মানসিকতা এখনও এ দেশের মানুষের মনে গড়ে ওঠেনি। পাখি শিকারের নামে হাওরে ঘুরে বেড়ানোর সংস্কৃতি এ দেশের মানুষের মধ্যে আগে ছিলো, এখনও আছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে পৃথিবী যখন সোচ্চার তখন আমাদের হাওরে পাখি শিকার করা হচ্ছে। কিন্তু এই পাখিগুলো সংরক্ষণ করে হাওর এলাকায় পর্যটন গড়ে উঠতে পারে। আমরা উপার্জন করতে পারি বৈদেশিক মুদ্রা। স্থানীয় জনসাধারণের নতুন পেশা সৃষ্টি হতে পারে।

হাওর এলাকায় পর্যটন যে কোনো সময় গড়ে উঠতে পারে। কেননা, হাওরগুলো যেসব জেলায় রয়েছে সেখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিরাপত্তা। বর্ষায় হাওরের পানিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা যেতে পারলে এখানে ট্যুরিস্ট আকৃষ্ট হবে।

বাংলাদেশের পাহাড়ি জেলা রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে গড়ে উঠতে পারে পানিভিত্তিক ট্যুরিজম। রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে এখন

দূর্গাপুরের নয়নমুগ্ধ বিরিশিরি এলাকা

চলছে বিভিন্ন নৌকা। এই নৌকায় চড়ে যাওয়া যায় মারিশ্যা, কাসালং, শুভলং, বরকল, বাঘাইছড়ি। রাঙ্গামাটির প্রতিটি এলাকাতেই রয়েছে নৈসর্গিক দৃশ্য। চারদিকে পাহাড়, ঘন জঙ্গল, তার মাঝে নৌকা নিয়ে লেকে বেড়ানো, পাহাড়িদের জীবনযাত্রা উপভোগ করা ট্যুরিস্টদের জন্য আকর্ষণীয় বিষয়। তবে এখানে এখন যেসব নৌকা চলছে তা দীর্ঘ সময় বেড়ানোর উপযোগী নয়। রাঙ্গামাটি থেকে সাজেক ভ্যালি, কাসালং প্রভৃতি নয়ন জুড়ানো এলাকা ঘুরে আসতে অন্তত ২ দিনের প্রয়োজন। রাত কাটানো, থাকা-খাওয়ার সুবিধাসহ নৌকার ব্যবস্থা করা গেলে রাঙ্গামাটির শুধু এই পানিপথকে ঘিরেই গড়ে উঠতে পারে এক ধরনের পর্যটন। তাছাড়া সাজেক ভ্যালি, কাসালং, শুভলং, মারিশ্যায় থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

একইভাবে বান্দরবানের নদীপথেও গড়ে উঠতে পারে এ ধরনের ট্যুরিজম। বান্দরবানে রয়েছে শঙ্খ বা সাংগুনদী। এই নদীপথে যাওয়া যায় রুমা বাজার। বান্দরবান থেকে রুমা বাজার যাওয়া-আসায় পুরো এক দিন সময় লেগে যায়। এই নদীপথটিকে ঘিরে পর্যটন গড়ে তোলা যায়। বান্দরবান থেকে রুমা বাজার পর্যন্ত অপূর্ব সুন্দর এই নদীপথ-ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করবে। এখন এই পথে যেসব নৌকা চলাচল করে তা খুবই অনুন্নত। তাছাড়া নৌকাগুলোতে যেভাবে যাত্রী বোঝাই করে লোক নেয়া হয়, তা দেখে ট্যুরিস্টরা তাদের বেড়ানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অনেক ট্যুরিস্ট স্থানীয় বন্ধুদের পরামর্শে উঠে পড়ে ঢাকা-খুলনা জাহাজে। জাহাজেই ফেরত চলে আসে। তারা পদ্মা মেঘনার বিশালতায় মুগ্ধ হয়।

রাঙ্গামাটির ডিয়ার পার্কের নয়নাভিরাম ঝুলন্ত সেতু

উপকূলীয় এলাকা ও বিভিন্ন চর

বাংলাদেশে রয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা। রয়েছে ছোট ছোট চর বা দ্বীপ। এই উপকূল এবং চরগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের কোস্টাল পর্যটন শিল্প।

একেবারে দেশের দক্ষিণ থেকে যদি শুরু করা যায় তবে প্রথমেই পড়বে সেন্টমার্টিন দ্বীপ। স্বচ্ছ, নীল পানির মধ্যে গড়ে ওঠা এই প্রবাল দ্বীপটি এখন দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্থান। সেন্টামার্টিনে থাকার জন্য এখন ভালো ভালো হোটেল, রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। খাবারের দোকানগুলো সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। নারিকেল গাছে ঘেরা এই দ্বীপটির দক্ষিণে রয়েছে কেয়া বাগানে ঘেরা ছেঁড়া দ্বীপ। জোয়ারের সময় মূল সেন্টমার্টিনের সঙ্গে দ্বীপটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই দ্বীপটির এ ধরনের নামকরণ হয়েছে।

ভোলার চর কুকরি মুকরি বনাঞ্চল

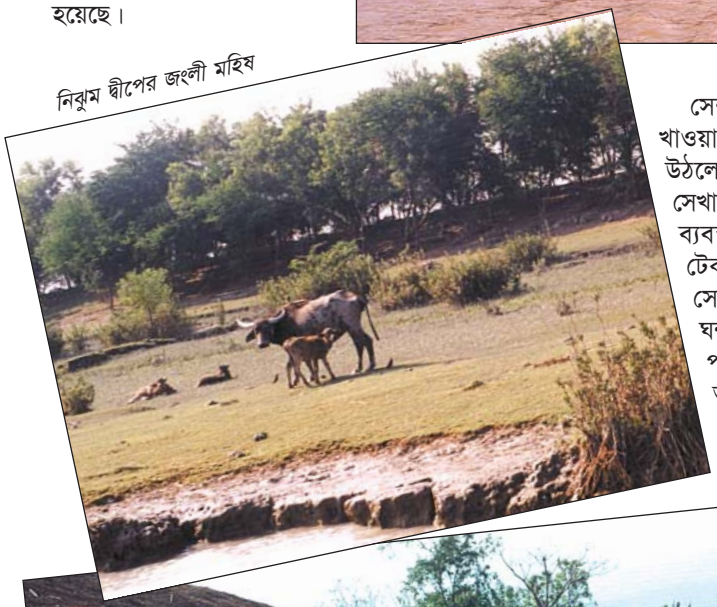

নিঝুম দ্বীপের জংলী মহিষ

সেন্টমার্টিনে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা গড়ে উঠলেও এখন পর্যন্ত সেখানে ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন দীর্ঘ ৪ ঘন্টার এই সমুদ্রপথ পাড়ি দিতে বছরের অধিকাংশ সময় পর্যটকদের ট্রলারের ওপর নির্ভর করতে হয়। সেন্টমার্টিনের বিলাসবহুল হোটেল প্রাসাদ প্যারাডাইজ সেন্টমার্টিনে বেড়ানোর জন্য সীট্রাকের ব্যবস্থা করেছে। কক্সবাজারে অবস্থিত হোটেল সীগালের সাথে যৌথ উদ্যোগ প্রাসাদ প্যারাডাইজ সেন্টমার্টিন বেড়ানোর বিভিন্ন প্যাজেকের আয়োজন করেছে এ বছর থেকে।

টেকনাফে রয়েছে একটি সুন্দর সমুদ্র সৈকত। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ শহরে ঢোকার মুখে ৫ কিলোমিটার আগে এই বিচটির অবস্থান। অপূর্ব সুন্দর এই বিচটিকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে একটি পর্যটন স্পট।

টেকনাফ থেকে নাফ নদী হয়ে যাওয়া যায় শাহপরীর দ্বীপে। সুন্দর এই দ্বীপটি নাফ নদীর শেষ সীমান্ত আর সাগরের শুরুর মুখে পড়েছে। শাহপরীর দ্বীপে রয়েছে বিশাল পাহাড়, জঙ্গল আর সমুদ্র। টেকনাফ থেকে বালির মধ্য দিয়ে চান্দের গাড়িতে করে যাওয়া যায় এই সুন্দর দ্বীপটিতে। এই দ্বীপে একটি ভালো পরিচ্ছন্ন বিচ রয়েছে। শাহপরীর দ্বীপে সামুদ্রিক জেলে জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। জেলে জীবন, পাহাড়, বনাঞ্চল, সমুদ্র সৈকত- সব দিক থেকে দ্বীপটি একটি পূর্ণাঙ্গ পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে উত্তরে রয়েছে ইনানী বিচ। বিচের পাশে রয়েছে বিশাল বালুময় নির্জন এলাকা। সুন্দর, শান্ত পরিবেশের

এই বিচটির আশপাশে জনবসতি খুব কম। তাই এই বিচের পরিবেশ এখনও শান্ত রয়েছে। লোকজনের ভিড় তেমন একটা নেই। ইনানী বিচ দীর্ঘদিন থেকে মানুষের পরিচিত থাকলেও এখানে পর্যটন গড়ে ওঠেনি। কক্সবাজার বিচে বেড়াতে যাওয়া কিছু লোক এই বিচ এলাকায় বেড়াতে আসে। তবে পর্যটকদের জন্য এখানে কোনো সুব্যবস্থা নেই। শুধু বন বিভাগের একটি রেস্ট হাউজ রয়েছে।

কক্সবাজারের কাছেই মহেশখালী। কক্সবাজার থেকে স্পিডবোটে যেতে হয় মহেশখালী। মহেশখালীতে রয়েছে প্রাচীন আদ্যিনাথের মন্দির। এই মন্দিরটিতে হিন্দু সম্প্রদায় পূজা দিতে আসে এবং পর্যটকদের দৃষ্টি কাড়ে। মহেশখালী থেকে একটি ছোট লেগুন পেরুলেই সোনাদিয়া এলাকা। মহেশখালী থেকে ৩ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এ এলাকাটি। এখানে রয়েছে মুদিরছড়া নামে একটি এলাকা। এই এলাকাটিকে ঘিরে রয়েছে নানা ধরনের হিন্দু উপাখ্যান। এখানে জনবসতি একেবারে নেই। মাছ ধরার মৌসুমে এখানে অস্থায়ী কিছু বসতি গড়ে ওঠে। এখানে রয়েছে বিশাল এক বনভূমি। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই বনভূমিতে রয়েছে বিভিন্ন জাতের বণ্য প্রাণী। এদের মধ্যে হনুমান, হরিণ, বিভিন্ন জাতের পাখি অন্যতম। তাছাড়া মহেশখালীতে কিছু অপূর্ব বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এ সবকিছু মিলিয়ে মহেশখালী হয়ে উঠতে পারে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র।

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপটিতেও এক সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠা সম্ভব। মহেশখালী থেকে ইঞ্জিনবোটে চড়ে যাওয়া যায় এই দ্বীপটিতে। তবে মাঝে রয়েছে কুতুবদিয়া চ্যানেল। এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগে এই চ্যানেল পার হতে। নয়ন মুগ্ধ করা এই দ্বীপটিতে জনবসতিও রয়েছে। সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সুবিধার্থে এখানে রয়েছে এক প্রাচীন বাতিঘর। দ্বীপবাসীর অধিকাংশই নিম্ন আয়ের মানুষ। পেশায় জেলে। দ্বীপটির চারদিকে সমুদ্র। এখানে এসে সাগরের জেলে জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সাগরে মাছ শিকারের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ হয়।

চট্টগ্রাম শহর অথবা কুতুবদিয়া থেকে যাওয়া যায় বাঁশখালী এলাকায়। বাঁশাখালীতে একটি ছোট বিচ রয়েছে। বিচের পাশেই রয়েছে উঁচু পাহাড়। বন বিভাগ এখানে বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে তুলেছে বনাঞ্চল। বাংলাদেশ বন বিভাগের এখানে ইকোপার্ক গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনাও রয়েছে। বন, পাহাড় আর সমুদ্র সৈকত মিলে বাঁশখালীতে একটি পর্যটন স্পট গড়ে তোলা যেতে পারে।

বেসরকারিভাবে এখানে পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

কর্ণফুলী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম ফার্টিলাইজার মিলের দেড় মাইল দক্ষিণে একটি পিকনিক স্পট রয়েছে। এলাকাটি চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা হিসেবেই পরিচিত। এখানে বন বিভাগের একটি ঘন বনাঞ্চল রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে নয়ন জুড়ানো একটি ঝর্না ও বাগান। চট্টগ্রামের প্রচুর লোকজন এখানে পিকনিক করতে আসে। এই এলাকা থেকে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা যায়। নয়নাভিরাম এই এলাকাটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী এলাকার লোকজন কম সময়ে এখানে বেড়িয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপের পাশেই রয়েছে উড়িরচর। দ্বীপবাসীর আসল জীবন দেখার জন্য এটি একটি উপযুক্ত স্থান। এদের নিরিবিলি, অসহায় জীবনযাপন সত্যিই সাধারণ মানুষকে নাড়া দেয়। এখানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো বর্ষাকালে জোয়ার-ভাটার তারতম্য। বর্ষকালে জোয়ারের সময় সাধারণ পানির স্তর দুই থেকে আড়াই ফুট উঁচু দেয়ালের মতো হয়ে দ্বীপের দিকে এগুতে থাকে। পানির দেয়ালের এই এগিয়ে আসার দৃশ্য খুবই আকর্ষণীয়।

চট্টগ্রামের মিরেরশ্বরাইয়ের বামনসুন্দর এলাকাটি আর একটি আকর্ষণীয় স্থান। এখানে বন বিভাগের একটি মনুষ্য সৃষ্ট বনভূমি রয়েছে। এই বনভূমি ৩ মাইল চওড়া, ২০ মাইল লম্বা। এটি বাংলাদেশের মনুষ্য সৃষ্ট ম্যানগ্রোভ বনভূমির একটি বড় অংশ। এই বনে রয়েছে হরিণ ও বিভিন্ন প্রজাতির বন্য পাখি। আমরা অনেকেই জানি না, বাংলাদেশেই রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মনুষ্য সৃষ্ট ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক। এটি বাংলাদেশের বন বিভাগের একটি সংরক্ষিত বন এলাকা। কতগুলো পাহাড় নিয়ে গড়ে ওঠা এই ইকোপার্কে রয়েছে নয়ন জুড়ানো প্রাকৃতিক দৃশ্য। পাহাড়ের গা বেয়ে বয়ে চলা 'সহস্রধারা' নামের ঝর্নাধারাটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এই ইকোপার্কটিতে কয়েক বছর আগে বণ্য প্রাণী ছাড়া হয়েছে। এখানে কিছু রেস্ট হাউজ বা গেস্ট হাউস স্থাপনা করা হলে এলাকাটির প্রতি পর্যটক আকৃষ্ট করা যাবে। তবে এখানে বর্তমানে পিকনিকের জন্য প্রচুর লোকসমাগম ঘটে।

নোয়াখালী

প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি নিঝুম দ্বীপা বঙ্গোপসাগরের বুকে জেগে ওঠা এই দ্বীপটির আয়তন ৬৩ বর্গ কিলোমিটার, দ্বীপটিতে রয়েছে এক বনভূমি। এই বনভূমিতে রয়েছে অসংখ্য হরিণ, বন মোরগ, বন মহিষ, বানর আর রঙ বেরঙের পাখি। তবে এখানে সবগুলো বন্য প্রাণী ছাড়া হয়েছে। দ্বীপটির বন মহিষগুলোর রয়েছে চমৎকার ইতিহাস। এই দ্বীপের একদিকে ১৫ হাজার লোকের জনবসতি রয়েছে। দ্বীপের লোকজনের গৃহপালিত মহিষ মাঝে মাঝে বনের মধ্যে হারিয়ে যায়। আর ফিরে আসতে পারে না। বনের মধ্যেই বসবাস শুরু করে, বাচ্চা দেয়। এভাবেই এখানের বনে বন্য মহিষের বাসস্থান

গড়ে ওঠেছে। এরা থাকে একেবারে গভীর বনের ভেতর। খুব কমই এদের দেখা পাওয়া যায়। বন মহিষগুলো দেখতে সত্যিই ভয়ঙ্কর।

এই দ্বীপটিতে রয়েছে দীর্ঘ এক সমুদ্র সৈকত। এই দ্বীপের বনভূমি পুরোটাই একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। তবে এখন দ্বীপবাসী এই বনের গাছ কেটে ফেলছে। ফলে বনের পশু-পাখিগুলো দিনে দিনে অসহায় হয়ে পড়ছে। এই দ্বীপটিতে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। এখানে সবকিছুই রয়েছে। শুধু প্রয়োজন ট্যুরিস্টদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা আর থাকার ব্যবস্থা। এখন এই দ্বীপে থাকার জন্য বন বিভাগের বাংলো রয়েছে। বেসরকারিভাবে দু-একটির কাজ শুরু হয়েছে। নিঝুম দ্বীপের পাশে রয়েছে চর পিয়াল ও চর নুরুল ইসলাম। এই দুটি চর এলাকার সবটুকুই বনভূমি। এটা হতে পারে নিঝুম দ্বীপের পর্যটকদের জন্য অতিরিক্ত আকর্ষণ।

নোয়াখালীর মাইজদী থেকে বাসে চড়ে যেতে হয় স্টিমার ঘাট। সেখান থেকে ট্রলারে করে হাতিয়া। সেখান থেকে সি ট্রাকে চড়ে যেতে হয় এই নিঝুম দ্বীপে।

হাতিয়ার অন্য একটি অংশে রয়েছে ঘাসিয়ার চর এলাকা। এখানে প্রচুর পাখি রয়েছে। রয়েছে বুনো হরিণ। ঘাসিয়ার চরের পাশেই রয়েছে ঢালচর। প্রায় ১ হাজার হেক্টর বনভূমির এই এলাকাটিতে জন বসতি নেই। এখানে একটি সাফারি পার্ক করা যেতে পারে।

ভোলা : বাংলাদেশে দক্ষিণের জেলা ভোলা। ভোলা সমুদ্র আর মেঘনার মোহনায় গড়ে ওঠা একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আকর্ষণীয় স্থান। এই স্থানগুলোতে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে পুরো ভোলা জেলাটিকেই একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

ভোলা সদর থেকে বাসে চরে চর ফ্যাশনের কচ্ছপিয়া যাওয়া যায়। এরপর ট্রলারে ২ ঘন্টার পথ। পৌঁছে যাওয়া যায় চর কুকরি মুকরিতে। চর কুকরি মুকরি বন বিভাগের একটি বিশাল বনাঞ্চল। এই চরটিতে গত কয়েক বছর যাবৎ কিছু জনবসতি গড়ে উঠেছে। এটি বন বিভাগের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বাংলাদেশে সরকার এটিকে ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করলেও আজও সেখানে পর্যটক আকর্ষণ করার মতো কোনো অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। চর কুকরি মুকরির ঘন জঙ্গলে রয়েছে বন্য হরিণ।

ঘুরে আসুন সাফারি পার্ক

আমরা অনেকেই জানি না আমাদের দেশেও একটি সাফারি পার্ক রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক নামের এই সাফারি পার্কটি অবস্থিত কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা এলাকায়। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পাশেই অবস্থিত এই সাফারি পার্কটি। কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামের দিকে ৩৫ কিলোমিটার পথ পেরুলেই এখানে পৌঁছে যাওয়া যায়। সময় লাগে সর্বোচ্চ ১ ঘন্টা।

দেশের একমাত্র সাফারি পার্কটির এখনও সব কাজ শেষ হয়নি। ৯০০ হেক্টর এলাকার মধ্যে ৩০০ হেক্টর এলাকায় কাজ শেষ হয়েছে। সাফারি পার্কের উন্নয়ন কাজ সম্পূর্ণ শেষ না হলেও এখনই সেখানে বেড়াতে যাওয়া যায়। পার্কে রয়েছে অর্ধশতাধিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। রয়েছে শতাধিক প্রজাতির বন্য পাখি, অর্ধশতাধিক সরিসৃপ ছাড়াও এখানে রয়েছে বেশ কিছু উভচর প্রাণী। এদেশের বিলুপ্ত প্রায় বেশ কিছু প্রাণী এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রায় কয়েকশ' প্রজাতির বৃক্ষ আর লতাগুল্ম রয়েছে পার্কে।

তাছাড়া বিভিন্ন জাতের পাখির জন্য পাখিপ্রেমীদের কাছে এই চরটির প্রশংসা রয়েছে। এখানে রয়েছে বালিয়াড়ি। শীতকালে এই বালিয়াড়িতে দেশী-বিদেশী পাখির সমাগম ঘটে। বন বিভাগের ভাঙা কিছু টিনশেড ঘর ছাড়া এখানে পর্যটকদের জন্য আর কিছুই গড়ে ওঠেনি।

চর কুকরি মুকরির পাশেই রয়েছে ঢালচর। ছোট্ট এই দ্বীপটিতে রয়েছে ছোট ছোট সি বিচ। গোছানো ছিমছাম এই বিচগুলোকে কেন্দ্র করে এখানে একটি পর্যটন স্পট গড়ে উঠতে পারে। পানির মধ্যে আগুন জ্বলার দৃশ্য এখানে দেখা যায়। অমাবস্যার রাতে নৌকা নিয়ে ঘুরতে বের হলে পানিতে আগুনের এই দৃশ্য দেখা যায়। এখানে ম্যানগ্রোভের পাশাপাশি সাধারণ বনাঞ্চল রয়েছে। ছোট ছোট বিচগুলো খুবই আকর্ষণীয়। এই বিচগুলো উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

ঢালচরের পাশেই রয়েছে চর শাহজালাল। চর শাহজালাল পুরোটাই একটা বনভূমি। এখানে ৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি বিচ রয়েছে। বিচের পাশেই রয়েছে প্রাকৃতিক বনভূমি।

ভোলা থেকে শশীগঞ্জ ঘাট হয়ে ট্রলারে চড়ে যেতে হয় মনপুরা। তবে স্পিডবোটে চড়েও মনপুরা যাওয়া যায়। মনপুরার ২০০/২৫০ বছরের ইতিহাস রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, পর্তুগিজ জলদস্যুদের এখানে নির্বাসনে পাঠানো হতো। এদের সঙ্গে থাকতো কুকুর। সেই কুকুরের জাত বিশাল বিশাল লোমশ কুকুরগুলো এখনও মনপুরাতে দেখা যায়। মনপুরা একটি আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন স্থান।

মনপুরার দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে পচাকুড়ালিয়া। এখানেও রয়েছে এক বনভূমি। সেই বনভূমিতে রয়েছে হরিণ। বর্ষা মৌসুমে এখানে প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে। ইলিশ মাছ ধরা থেকে যাবতীয় প্রক্রিয়া করণের কাজ এখানে করা হয়। ইলিশ আর জংলি হরিণকে ঘিরে এখানে একটি মনোমুগ্ধকর পর্যটন স্পট গড়ে উঠতে পারে।

পটুয়াখালী

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতের জন্য বিখ্যাত বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলাটি। ঢাকা থেকে লঞ্চে পটুয়াখালী- সেখান থেকে বাসে চড়ে যাওয়া যায় কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে। তাছাড়া ঢাকা থেকে বিআরটিসির গাড়িতে সরাসরি কুয়াকাটা যাওয়া যায়। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য বাংলাদেশের এই সমুদ্র সৈকত থেকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। কুয়াকাটায় রয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল। গত কয়েক বছরে এখানে বিভিন্ন দাম আর মানের প্রচুর হোটেল গড়ে উঠেছে।

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা ছাড়াও আরও কিছু এলাকা রয়েছে সেগুলোকে ভিত্তি করে পটুয়াখালীকে ট্যুরিস্ট জেলা হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এর মধ্যে রয়েছে সোনার চর। সোনার চরে বন বিভাগের বনাঞ্চলে রয়েছে প্রচুর হরিণ। এর চারপাশে রয়েছে ছোট ছোট খাল। খালের পাশে গড়ে উঠেছে গোলপাতার

বাগান। এই খালগুলোতে প্রচুর ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। গোলপাতা, খাল আর হরিণ মিলিয়ে এখানে সুন্দরবনের একটি আবেশ রয়েছে। তবে এখানে বাঘের ভয় নেই। সোনার চরের সঙ্গে সুন্দরবনের শুধু এতটুকুই পার্থক্য। এখানে রয়েছে ১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সমুদ্র সৈকত। এখানে যদি ট্যুরিস্টদের জন্য ভালো ব্যবস্থা করা যায়, তবে সোনারচর একটি ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে। সোনার চরের পাশেই রয়েছে চর কবির। এখানেও একটি ছোট বিচ রয়েছে। এলাকাটি খুবই আকর্ষণীয়। পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি থানার চর তালুকদার ও মওডুবি এলাকা। এই এলাকা দুটো পুরোটাই বন বিভাগের। মওডুবি এলাকায় কিছু রাখাইন তাদের জনবসতি গড়ে তুলেছে। তাছাড়া চর তালুকদার একেবারেই জনশূন্য। চরগুলোর চারদিকে রয়েছে পানি। মাঝের বনাভূমিতে রয়েছে বন্য হরিণ, শিয়াল, আর বিভিন্ন জাতের পাখি। রয়েছে ছোট ছোট কয়েকটি বিচ।

পটুয়াখালীর এই এলাকাগুলোতে পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা করা হলে এখানে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা সম্ভব। পটুয়াখালী থেকে বাসে চড়ে গলাচিপা থানা। গলাচিপা থেকে স্পিডবোটে আধ ঘন্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় এসব দৃষ্টিনন্দন এলাকাগুলোতে।

এখন বছরের অধিকাংশ সময় পর্যটকদের ভিড় থাকে সুন্দরবনে

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

বাংলাদেশের বর্তমান যে ভূখন্ড রয়েছে সেখানে বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষের বসতি ছিল। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত নিদর্শন থেকে জানা যায়, এই এলাকায় খ্রিষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে জনবসতি ছিল, তাছাড়া বিভিন্ন সময় এই এলাকাটি বিভিন্ন গোত্র, জাতি শাসন করেছে। এদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানরা রয়েছে। এদের শাসনামলে এই জাতিগুলো বিভিন্ন দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, নগরী তৈরি করেছে যা আজ আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এই স্থানগুলোর সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের পরিচায়ক। তাছাড়া এগুলোকে কেন্দ্র করে এ দেশের পর্যটন শিল্প গড়ে উঠতে পারে। বিশ্বব্যাপী পর্যটকদের এখনও প্রত্নস্থান দর্শনের আগ্রহ রয়ে গেছে।

চট্টগ্রামের কাপ্তাই এলাকার বন বিশ্রামাগার বনফুল

বাংলাদেশে আবিস্কৃত ও অনাবিষ্কৃত প্রত্নস্থানের সংখ্যা অসংখ্য। বর্তমানে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত প্রত্নস্থানের সংখ্যা সাড়ে ৩০০। এর মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং তা দেশের প্রাচীন ইতিহাস, ঐতিহ্য বহন করে।

মহাস্থান গড়

বগুড়া শহর থেকে ১২ কিলোমিটার উত্তরে শিবগঞ্জ থানা। সেই থানার পাশ দিয়ে এক সময় বেয়ে চলতো প্রমত্ত করোতোয়া। সেই করোতোয়ার পাশেই আজ থেকে সাড়ে ৪ হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল পুন্ড্র নগর। সেই পুন্ড নগরের বর্তমান নাম মহাস্থান গড়।

এই এলাকায় কয়েক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছিল পুন্ড্র নগর। সাড়ে ৪ হাজার ফুট লম্বা ও ৫ হাজার ফুট প্রস্থ এলাকা জুড়ে মূল নগরীর চারদিকে ছিল প্রাচীর। বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক আধিদপ্তর বর্তমানে এর প্রাচীরের সবটুকু জায়গা সংরক্ষিত করেছে। কিন্তু সবটুকু জায়গা এখনও খনন করে উত্তোলন করা হয়নি। তবুও বেশকিছু জায়গা তারা খননের মাধ্যমে উত্তোলন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে কালির ভিটা, শিলা দেবীর ঘাট, জিওতকুন্ড, গবীন্দ ভিটা, গকুল ভিটা (বেহুলা লখিন্দরের বাসরঘর), বাসু বিহার, মহাস্থান মসজিদ, খোদাই পাথর ঢিবি, পরশুরামের প্রাসাদ, বৈরাগীর ভিটা, নিতাই ধোপানরি ঘাট অন্যতম। এর প্রতিটি স্থানই পাশাপাশি রয়েছে। এই এলাকায় মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, সুলতানি আমলের সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাই এখানে বিভিন্ন আমলের প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায়। মহাস্থান এলাকায় রয়েছে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি জাদুঘর।

বগুড়া শহর থেকে বাসে মহাস্থান, সেখান থেকে রিকশায়। ১ কিলোমিটার পথ পার হলেই প্রাচীন পুন্ড্র নগরে পৌছে যাওয়া যায়।

মহাস্থানগড়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি রেস্ট হাউজ ছাড়া থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। তবে বগুড়ায় বিভিন্ন হোটেল ছাড়াও পর্যটন কর্পোরেশনের একটি মোটেল রয়েছে।

পাহাড়পুর

নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানার পাহাড়পুর ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে রয়েছে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার। এর আদি নাম সোমপুর বৌদ্ধ বিহার। রাজ ধর্মপাল এই বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন। এই বিহার এলাকা ৯২২ ফিট লম্বা ও ৯২০ ফিট চওড়া। এর মাঝখানে ক্রুশাকৃতির ৭২ ফিট উচ্চতায় একটি মন্দির রয়েছে। বিহারের ভেতর চতুর্দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ১৭৭টি কক্ষ রয়েছে। এটি ছিল বৌদ্ধদের উপাসনালয় ও ধর্ম বিষয়ক শিক্ষালয়। ভিক্ষুদের কক্ষগুলোর সামনে রয়েছে বারান্দা ও উন্মুক্ত স্থান। রয়েছে স্তূপা, রান্নাঘর, গণটয়লেট। সব মিলিয়ে এই বিহারটি ছিল প্রাচীন কালের একটি আদর্শ শিক্ষালয়। পাহাড়পুরের এই বৌদ্ধ বিহারটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে জাপানিদের বিহারের আশপাশে আরও বেশ কিছু প্রত্নস্থান রয়েছে। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে নওগাঁ থেকে যাওয়া যায়। তবে নওগাঁ জেলার সর্ব উত্তরে এর অবস্থান হওয়ায় জয়পুরহাট থেকে এই এলাকায় যাওয়া সবচেয়ে সহজ। জয়পুরহাট জেলা থেকে ১২ কিলোমিটার পাকা রাস্তা পেরুলেই পৌছানো যায় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারে।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের পাশেই রয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের একটি জাদুঘর। অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ ছাড়া বিহারের আশপাশে থাকার আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

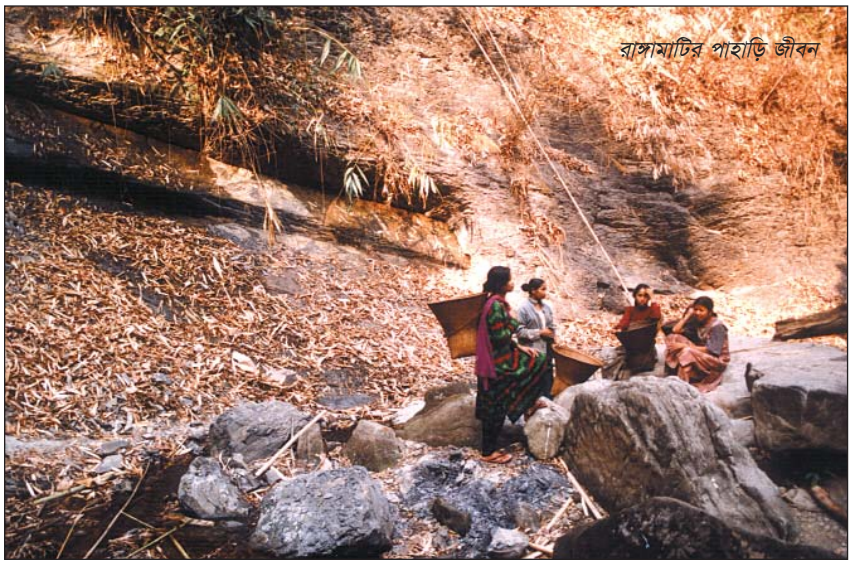
রাঙ্গামাটির পাহাড়ি জীবন

১২শ' টাকার কেওকারাডং ভ্রমণ

মাত্র ১২শ' টাকা আর ৪ দিন খরচে আপনি ঘুরে আসতে পারেন দেশের সর্বোচ্চ পাহাড় কেওকারাডং। আজ রাতের এস আলম পরিবহনের ঢাকা-বান্দরবান বাসে উঠে পড়ুন। পরদিন খুব ভোরে পৌঁছে যাবেন বান্দরবান শহরে। খরচ পড়বে ২০০ টাকা। বান্দরবান শহরে নেমে ফ্রেশ হয়ে আর সকালের নাস্তা সেরে চড়ে বসুন চান্দের গাড়িতে। ৫০ টাকা খরচে এই চান্দের গাড়িতে করে পৌঁছে যাবেন রুমা বাজার, রুমা বাজার থেকে একজন গাইড নিন। ১০০ টাকা দিলেই সে আপনাদের কেওকারাডং ঘুরিয়ে আনবে। রুমা বাজারে দুপুরের জন্য শুকনো খাবার নিয়ে নিন। এবার হাঁটা শুরু করুন। বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাবেন বগা লেক এলাকায়। এখানে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কটেজ রয়েছে। কটেজে অথবা স্থানীয় কোনো বোমা পরিবারের সঙ্গে রাত কাটাতে পারেন। থাকা খাওয়াসহ খরচ হবে সর্বোচ্চ ২০০-৩০০ টাকা। পরদিন খুব ভোরে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়ুন। দার্জিলিং পাড়া এলাকা আর কেওকারাডং-এর চূড়া বেড়িয়ে বিকেলের মধ্যে আবার পৌঁছে ফিরে আসতে পারবেন বগা লেক এলাকায়। সে রাত বগা লেক এলাকায় কাটিয়ে পর দিন সোজা নিজের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিন। অল্প টাকা আর স্বল্প সময়ে বেড়িয়ে আসুন মনোরম এই পাহাড়ি এলাকা।

হাওর এলাকার জেলে জীবন

শালবন বিহার

কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ি এলাকা। পুরো পাহাড়ের পাদদেশে ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক বিশাল জনবসতি গড়ে উঠেছিল। এর নাম সমতট রাজ্য।

এখানে প্রচুর প্রত্নস্থান পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ এলাকায় ৫৫০ বর্গফুটের একটি বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি বৌদ্ধ বিহার। প্রাচীনকালে এটি ছিল বৌদ্ধদের ধর্মভিত্তিক শিক্ষালয়। এখানে ভিক্ষুদের থাকার জন্য ১১৫টি কক্ষ রয়েছে। এর মাঝে রয়েছে কেন্দ্রীয় মন্দির ও অসংখ্য স্তুপা।

শালবন বিহার এ দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধ আর্কিটেকচারের একটি। এই বিহারের পাশে রয়েছে একটি জাদুঘর। রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি রেস্ট হাউজ। আর এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। কুমিল্লা শহর থেকে ১০ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় এই বিহারে। শালবন বিহার আর লালমাই পাহাড়ের এক অপরূপ দৃশ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। তাই বছরের সব সময়ে এখানে পিকনিক করতে আসে দেশের বিভিন্ন এলাকার লোকজন।

ষাটগম্বুজ মসজিদ

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদটি ১৪০০ সালের। ধর্ম প্রচারক খান জাহান আলী এটি স্থাপন করেন। খান জাহান আলী ঝিনাইদহের বারোবাজার এলাকা দিয়ে এ ভূখন্ডে প্রবেশ করেন। তিনি বেশ কিছুদিন ঝিনাইদহের বারোবাজার এলাকায় অবস্থান করেন। তখনকার দিনে মুসলিম ওলিরা যে এলাকায় থাকতেন সেখানে মসজিদ নির্মাণ ও পুকুর খনন করতেন। বারোবাজারে প্রচুর মসজিদ ও পুকুর রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় খান জাহান আলী বাগেরহাটে নির্মাণ করেন ষাটগম্বুজ মসজিদ। এই এলাকাটি ছিল সুলতানি আমলে বাংলার আঞ্চলিক রাজধানী। বাগেরহাট শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে খুলনা-বাগেরহাট মহাসড়কের ওপর মসজিদটি অবস্থিত। এ মসজিদের আশপাশে বেশকিছু বড় পুকুর ও সুলতানি আমলের কিছু নির্দশন রয়েছে। সুলতানি আমলে এখানে ছিল একটি টাকশাল। এখনও সেই টাকশালের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

ষাটগম্বুজ মসজিদের পাশে রয়েছে জাদুঘর। তাছাড়া এখানে রয়েছে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ। বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে ওটা ষাটগম্বুজ মসজিদ এবং বিশাল বিশাল পুকুরগুলোকে কেন্দ্র করে এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব।

বান্দরবান জেলাতেও উপভোগ করা যায় বলী খেলা

ছোট সোনা মসজিদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্থলবন্দর এলাকায় রয়েছে ছোট সোনা মসজিদ। এই মসজিদের আশপাশে আরো বেশকিছু মুসলিম প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে। এর মধ্যে দাড়াসবাড়ী মসজিদ, দাড়াসবাড়ী মাদ্রাসা, শাহ নেয়ামত উল্লাহ ওয়ালী মসজিদ, শাহ নেয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর সমাধি, শাহ সুজার তাহখানা, খানিয়াদীঘি মসজিদ, ধানীচক মসজিদ, রোহানপুর সমাধি, নওদা বুরুজ। মুসলিম আমলের এসব নিদর্শন ছোট সোনা মসজিদ এলাকার আশপাশে রয়েছে। সুলতানি আমলে এটি বাংলায় গৌড় রাজধানী নামে পরিচিত ছিল। এই নগরটিকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। শেষ পর্যন্ত এই নগরী প্লেগ রোগে ধ্বংস হয়ে যায়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানা এলাকায় এই মসজিদের অবস্থান। এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের একটি রেস্ট হাউজ রয়েছে।

কান্তজির মন্দির

দিনাজপুর শহর থেকে ২০ কি.মি উত্তরে রয়েছে কান্তজির মন্দির। ১৭৫২ সালে মহারাজ প্রাণনাথ এটি নির্মাণ করেন। তিনতলা বিশিষ্ট এই মন্দিরটি ৫০ স্কয়ার ফুট।

এই মন্দিরটির পুরো গা পোড়ামাটির ফলক দিয়ে অলঙ্কৃত। সেখানে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী চিত্রায়িত রয়েছে। টেরাকোটার এতো সুন্দর অলঙ্করণ বাংলাদেশের আর কোনো প্রত্নস্থানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই এলাকাটিও বাংলাদেশের একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে এ দেশের প্রত্নস্থানকে গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা এখন আর নেই বাংলাদেশ সরকারের। বেশ কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে সরকারের কিছু পদক্ষেপ ছিল। তখন বেশকিছু প্রত্নস্থানের পাশে ইয়ুথ ইন সেন্টার গড়ে তোলা হয়। এই সেন্টারে

ছিল পর্যটকদের থাকায় ব্যবস্থা। কিন্তু এখন আর সেই ইয়ুথ ইন সেন্টার নেই। অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকা সেসব রুম এখন ভিক্ষুক আর ভবঘুরের আবাসস্থল।

বৃহত্তর ময়মনসিংহের পর্যটন

ময়মনসিংহ শহর থেকে ১২ কিলোমিটার পথ। বাসে চড়ে পৌঁছে যাওয়া যায় মধুপুর বন এলাকায়। ঢাকা থেকে এই বনের ৩ ঘন্টা পথ। ঢাকার আশপাশের বনগুলোর মধ্যে এই বন এলাকাটি এখনও ভালো অবস্থায় রয়েছে। এই বনের মূল আকর্ষণ সোনালি হনুমান। খুব ভোরে এই হনুমানগুলো টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের উপর নেমে আসে। পাহাড়ের উঁচু- নিচু টিলায় গড়ে উঠেছে এই বনটি। এখানে হনুমান ছাড়াও বানর এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি দেখা যায়। আকর্ষণীয় এই বন এলাকাটিকে বাংলাদেশ বন বিভাগ মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করেছে। এই বন এলাকায় রয়েছে গারো উপজাতিদের বসবাস। বছরের বিভিন্ন সময় গারোরা তাদের নানা ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। গারোদের জীবন যাত্রাকে ঘিরে এই এলাকটিকে একটি পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

ন্যাশনাল পার্ক ঘোষণা করা হলেও এখানে ট্যুরিস্টদের জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। বন বিভাগের রেস্ট হাউজ ছাড়া এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে শূন্যের কোঠায়। এসব সমস্যার কারণে এই ন্যাশনাল পার্কটি রাজধানীর কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করতে পারছে না।

শেরপুর জেলার গজনী, শ্রীবর্দী, নালিতাবাড়ী এলাকাগুলো খুবই আকর্ষণীয়। এই এলাকাগুলো গারো পাহাড়ের পাদদেশে গড়ে উঠেছে। এলাকাগুলো পাহাড় আর ঘন জঙ্গলে ঘেরা। এখান থেকে ভারতীয় পাহাড় দেখা যায়। প্রায়ই এই পাহাড় থেকে বুনো হাতির পাল নেমে আসে।

শেরপুর জেলার গজনী এলাকাটি মূলত একটি পাহাড়ি এলাকা। অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত পাহাড়ে ঘেরা এই এলাকাটি পর্যটকদের কাছে খুবই প্রিয়। ঢাকা থেকে বাসে ৩ ঘন্টার পথ শেরপুর শহর। সেখান থেকে বাসে চড়ে আরো আধ ঘন্টার পথ পেরুলে যাওয়া যায় গজনী এলাকায়। গজনী অবকাশ কেন্দ্রে রয়েছে ৬ কক্ষ বিশিষ্ট একটি উন্নতমানের রেস্ট হাউজ। রেস্ট হাউজের পাশে রয়েছে ট্যুরিস্টদের জন্য বেড়ানোর বেশকিছু ব্যবস্থা। যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় এখানে খুব কম সময়ে বেড়িয়ে আসা যায়। তবে গজনীর পাহাড়ঘেরা নৈসর্গিক সৌন্দর্য আপনি এক দিনের বেশি উপভোগ করতে পারবেন না। কারণ বুনো হাতি। রাতের বেলায় গজনী এলাকায় পাহাড় থেকে নেমে আসে বুনো হাতি। আর তাই রাতে এ রেস্ট হাউজে রাত কাটাতে দেয়া হয় না। গজনী ও শ্রীবর্দীতে থাকার ব্যবস্থা করা গেলে নির্জন এই পাহাড়ি এলাকাগুলোতে ট্যুরিস্ট আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলার লাউচাপড়া পাহাড়টির অবস্থান হিমালয় পর্বতের কাছাকাছি। সবুজ ছায়াঘেরা এই পাহাড়টির অপর নাম রূপসী হিমকন্যা। লাউচাপড়া পাহাড়ে রয়েছে বিশাল রাবার বাগান ও বিভিন্ন জাতের গাছের সমাহার। আছে অসংখ্য পাহাড়ি টিলা। পাহাড়ে যতদূর দেখা যায় দুচোখে ভেসে আসে বাহারি বন ফুলের সমাহার, এখানকার পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ। ঝর্নার হাঁটুজল, চিকচিক বালি পর্যটকদের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু মনোমুগ্ধকর এই পাহাড়ি এলাকাটিতে একটি মাত্র বিশ্রামাগার ছাড়া পর্যটকদের জন্য আর কোনো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নেই। জামালপুর জেলা পরিষদ বেসরকারিভাবে 'বনফুল' নামের এই বিশ্রামগারটি স্থাপন করেছে। পর্যটকদের থাকা, পাহাড়ে বেড়ানো আর বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা করা হলে লাউচাপড়া পাহাড় বাংলাদেশের একটি অনন্য ট্যুরিস্ট স্পষ্ট হিসেবে পরিচিতি পাবে।

সাফারী পার্কের প্যারা হরিণ

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার পাহাড়ি এলাকা বিরিশিরি। খরস্রোতা পাহাড়ি কংস নদীর পাড়ে বিরিশিরি এলাকা, এলাকাটি ভারতের মেঘালয় রাজ্যের কাছাকাছি পড়েছে। বিরিশিরি মূলত গারো আদিবাসীদের এলাকা। পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা গারো বাড়িঘরগুলো খুবই আকর্ষণীয়। বিরিশিরিতে রয়েছে আদিবাসীদের কালচারাল একাডেমি। বিরিশিরিতে ডাকবাংলো রয়েছে। রয়েছে আবাসিক হোটেল। যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো থাকায় এলাকাটি ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করার কথা থাকলেও প্রচারের অভাবে এখনও ট্যুরিস্টদের নজরের বাইরে রয়েছে।

বিরিশিরি থেকে ১৫ মিনিট হাঁটার পথ। তারপর খরস্রোতা কংশ। কংস নদী পার হলেই সুসান দুর্গাপুর। এখানে রয়েছে দুর্গাপুর রাজবাড়ী। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাহাড় গারো পাহাড়ের পাদদেশে এই সুসন দুর্গাপুর এলাকা অবস্থিত। এখানে আরো রয়েছে পাহাড়ি উঁচু-নিচু টিলা, বন আর গারো আদিবাসী। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় দুর্গাপুরে।

দুর্গাপুরের কাছেই রয়েছে নেত্রকোনার কমলাকান্দা থানা। এটিও গারো পাহাড় এলাকা, গারো আদিবাসীদের আবাসস্থল। অভূতপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য রয়েছে কমলাকান্দা উপজেলাটিতে। কিন্তু এখানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো নয়। আর তাই এই কমলাকান্দা এলাকাটি এখনও ট্যুরিস্টদের পদচারণায় মুখরিত হতে পারেনি।

ময়মনসিংহ জেলাকে বলা হয় শিক্ষার নগরী। সেই প্রাচীন আমলের বিশাল বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ জেলায় প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য বহন করছে। জেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে।

ময়মনসিংহ জেলা থেকে ১ ঘন্টার পথ মুক্তাগাছার রাজবাড়ী। প্রাচীন স্থাপত্যকলার এক অপরূপ নিদর্শন এই রাজবাড়ীটি। এটি এখন বাংলাদেশ প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলা সদর থেকে বাসে ২ ঘন্টার পথ পেরুলে হালুয়াঘাট থানা। এটি একটি বর্ডার এলাকা। পাশেই রয়েছে ভারতীয় পাহাড়। গারো পাহাড়ের একটি অংশ এই থানা এলাকাটিতে পড়েছে। অপূর্ব সুন্দর এই পাহাড়ি এলাকাটিতে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো। শুধু প্রচারের অভাবে এই এলাকাটি এখনও ট্যুরিস্টদের আকর্ষণ করতে পারেনি।

সিলেটের বন আর পাহাড়ি ঝরনা

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এলাকায় বেশকিছু চা বাগান রয়েছে। এই চা বাগানগুলোর রয়েছে নান্দনিক সৌন্দর্য। পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট ছোট ঝরনা ধারা চলে গেছে বিভিন্ন চা বাগানের মধ্য দিয়ে। বাগান থেকে চা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়গুলো খুবই আকর্ষণীয়।

সিলেট শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার পথ। বাসে চড়ে পৌঁছে যাওয়া যায় সিলেটের অন্যতম পর্যটন স্পট জাফলং। গোয়াইনঘাট থানায় ভারতীয় সীমান্ত ঘেঁষে এর অবস্থান। ওপারে মেঘালয় রাজ্যের সবুজঘেরা গভীর অরণ্য। সারিবদ্ধ পাহাড়। আর এপাড়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা নদী। নদীর তলদেশ ভরে থাকে পাহাড়ি পাথরে।

জাফলংয়ে রয়েছে খাসিয়া পুঞ্জি। সিলেটের পাহাড়ি জনগণের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হওয়া যায় জাফলংয়ে এসে।

সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ এই এলাকাটি অবহেলার কারণে পর্যটকদের নজরে আসতে পারছে না। আর সরকারি কোনো উদ্যোগ না থাকায় দিনে

চরকুকরি মুকরির সংরক্ষিত বনাঞ্চল

দিনে নষ্ট হচ্ছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখন পর্যন্ত এখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। খুবই নিম্নমানের কিছু খাবারের হোটেল রয়েছে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জাফলং যেতে হয়, কিন্তু রাত কাটানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পর্যটকদের সেদিনই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সিলেট ফিরতে হয়। আর তাই জাফলং পরিচিতি পেলেও পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারছে না।

কেওকারাডংয়ের পথে

মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার পাথরিয়া পাহাড়ে অবস্থিত দেশের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক জলপ্রপাত মাধবকুন্ড। শ্রীমঙ্গল থেকে বাসে আড়াই ঘন্টার পথ। এখান থেকে যাওয়া যায় কাঁঠালতলী বাজার, কাঁঠালতলী বাজার থেকে রিকশায় মাধবকুন্ড। পাহাড় থেকে নেমে আসা মাধবকুন্ড জলপ্রপাতটি খুবই আকর্ষণীয়। জলপ্রপাতের পানিতে নৌকা নিয়ে বেড়ানো যায়। জলপ্রপাতের চারদিক ঘিরে রয়েছে পাহাড় আর ঘন বন। মাধবকুন্ডে জেলা পরিষদের একটি মাত্র রেস্ট হাউজ রয়েছে। তাছাড়া সেখানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই। পর্যটন কর্পোরেশনে শুধু একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। মাধবকুন্ডে প্রতিদিন প্রচুরসংখ্যক পর্যটক ঘুরতে আসে। তবে দিনে গিয়ে সেদিনই ফিরতে হয় বলে মাধবকুন্ড এখনও পর্যাপ্ত পর্যটক টানতে পারেনি।

বৃহত্তর সিলেট এলাকা শুধু পাহাড় আর জলপ্রপাতই নয়, এর রয়েছে নজরকাড়া কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চল। এর মধ্যে ঢাকার কাছে একটি ভালো বন এলাকা হলো সাতছড়ি। হবিগঞ্জ জেলার তেলিয়াপাড়া এলাকায় রয়েছে এই বনাঞ্চল। এটি একটি ছোট বন হলেও বনটি তার সৌন্দর্যে অপরূপ। এই বনটি বন্য প্রাণীতে সমৃদ্ধ। এখানে রয়েছে হুলুক, গিবন, উল্লুক। তাছাড়া ২-৩ ধরনের বানর দেখা যায় এই বনে। এই বন থেকে আর একটু এগুলোই রেমা ও কালেঙ্গা নামের দুটি বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলকে বন বিভাগ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। রেমা কালেঙ্গাকে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারী হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কারণ হলো এর প্রাণী বৈচিত্র্য। এই বনে রয়েছে বাঁদর, হরিণ, হনুমানসহ বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী।

রেমা, কালেঙ্গা থেকে কিছুদূর এগুলেই শ্রীমঙ্গল। শ্রীমঙ্গলে রয়েছে লাউয়াছড়া বন। অপূর্ব সুন্দর এই বনটি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এই বনটিকে ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। লাউয়াছড়া বনকে অনেকেই ভানুগাছ বনও বলে। এই বনে উল্লুক, গিবন, হনুমান দেখা যায়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে পাখি দর্শনে এই বনটি সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তাছাড়া রয়েছে আদমপুর বনাঞ্চল। মাধবপুরে ছোট্ট একটি জলাশয়কে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে ছোট একটি বন এলাকা। এই বন এলাকাটি দেখতে খুবই সুন্দর।

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া বড়লেখা এলাকার বর্ডারের অংশটিতে রয়েছে দক্ষিণ সমনবাগ বন এলাকা। এই বন এলাকায় দুর্লভ প্রজাতির চশমা পরা হনুমান দেখা যায়।

বাংলাদেশের বন এলাকার মধ্যে সিলেট এলাকায় বনাঞ্চল এখন সমৃদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। তাই এর বন্য প্রাণীগুলোর এখনও বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। শুধু বন্য প্রাণী নয়, পাখি দেখার জন্যও এই অপরূপ বন এলাকাগুলো পর্যটক আকর্ষণের দাবি রাখে। কিন্তু এই বনভূমিকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত কোনো পর্যটন স্পট গড়ে তোলা হয়নি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও রয়েছে উপেক্ষিত। তাছাড়া এই বনাঞ্চলকে ঘিরে একটি সাফারি পার্কও গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান বাংলাদেশের এই ৩টি পার্বত্য জেলার পুরো এলাকাই নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। পাহাড়, পাহাড়ি নদী, লেক, বন, বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠী, জলপ্রপাত, ঝরনাধারা সব মিলিয়ে এই জেলা তিনটির প্রতিটি থানাকে এক একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। ৩টি জেলারই সদরগুলো ঘুরে বেড়ানোর জন্য অসাধারণ।

রাঙ্গামাটি

যারা দূরে পাহাড়ি বনে বেড়াতে যেতে ভয় পায় তারা রাঙ্গামাটি শহরেই বেড়াতে পারবেন। কেননা, শহরটি দেখতে খুবই সুন্দর। শহরের চারদিকে বয়ে গেছে কাপ্তাই লেক। রাঙ্গামাটি শহরেই রয়েছে ডিয়ার পার্ক। ডিয়ার পার্কে রয়েছে বাংলাদেশের অতি পরিচিত ঝুলন্ত সেতুটি। ডিয়ার পার্ক থেকে নৌকা নিয়ে বেড়ানো যায় হরিনা, বিলাইছড়ি, শুভলং প্রভৃতি পর্যটন স্পটগুলো। বিলাইছড়ি, শুভলং, কাছালং, সাজেকভ্যালি প্রভৃতি এলাকাগুলোকে পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। রাঙ্গামাটি শহরে ৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে থাকার ভালো হোটেল রয়েছে। তাছাড়া এখানে পর্যটন মোটেল রয়েছে। কিন্তু পর্যটকদের জন্য যতটুকু সুবিধা তার সবটুকুই রাঙ্গামাটি শহরে। শুভলং এলাকায় একটি রেস্ট হাউজ কিছুদিন আগে গড়ে উঠলেও থাকার আর কোনো ব্যবস্থা নেই।

খাগড়াছড়ি : পাহাড়ের ওপর গড়ে উঠেছে খাগড়াছড়ি শহর। এই জেলাটির পাহাড়ে রয়েছে ঘন বনাঞ্চল, শহর থেকে চান্দের গাড়িতে চড়ে যাওয়া যায় দীঘিনালা। অপূর্ব এক নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী দেখতে পাওয়া যায় দীঘিনালায়। খাগড়াছড়িতে রয়েছে রামগড়। এটি একটি পাহাড়ি শহর। রামগড়ের হাফছড়ি ও পাতাছড়ি ইউনিয়নের ২ হাজার একর বনভূমিতে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর

বোটানিক্যাল গার্ডেন গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । এই জেলাতেই রয়েছে মানিকছড়ি ও গুইমারা এলাকা। গুইমারা একটি বিরাট বনভূমি এলাকা। সেখানে হিংস্র বন্যপ্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। বানর, হরিণ, বন্য শূকর রয়েছে এই বনাঞ্চলে।

মানিকছড়ি এলাকাটি হলো মং রাজার রাজধানী। মং রাজার রাজবাড়ি রয়েছে এখানে। শীতকালে রাজার কাছে খাজনা দিতে আসার উৎসব খুবই আকর্ষণীয়।

মানিকছড়ি বা গুইমারা এলাকায় বেড়ানোর কোনো সুবিধা এখনও গড়ে ওঠেনি। নেই কোনো থাকার ব্যবস্থা। কিন্তু মানিকছড়ির মং রাজার রাজধানী এবং গুইমারা বনাঞ্চল হতে পারে আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট স্পট। এই এলাকা দুটির চারপাশে শুধু পাহাড় আর বন। পাহাড়ের গায়ে গড়ে ওঠা বাড়িঘরগুলোর দৃশ্য খুবই সুন্দর।

খাগড়াছড়ি থেকে চান্দের গাড়িতে করে যেতে হয় দীঘিনালা। এখানে পাহাড়ি নদী, উঁচু পাহাড় রয়েছে। সুন্দর, নির্জন এই পাহাড়ি নদী এলাকাটিতে পর্যটকদের জন্য এখনও কোনো ব্যবস্থ নেয়া হয়নি। দীঘিনালায় থাকা এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হলে দীঘিনালা এলাকাটি একটি ভালো পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

বাংলাদেশের সমস্যাপূর্ণ পর্যটন

দৃশ্যপট ১ : কোলকাতার একটি ট্রাভেল এজেন্টের কাউন্টার। আমি বসে আছি কথা বলার জন্যে। এক নর্থ ইউরোপীয় দম্পতি কথা বলছেন এজেন্টের সঙ্গে। বাংলাদেশ ঢাকা শব্দগুলো কানে যেতে কান খাড়া করলাম। ওরা বলছে ল্যান্ডে বাংলাদেশ হয়ে থাইল্যান্ড যাবে। এজেন্ট বললো, তোমাদের বাংলাদেশের ভিসা নেই। আগে ভিসা নিয়ে এসো তারপর দেখা যাবে। ওরা বললো চেকপোস্টে ট্রানজিট ভিসা দেয়া হয় না? 'না' শুনে ওরা ভিসা সংগ্রহের পদ্ধতি জানতে চাইলো। দেখলো তাদের সময়ের সিস্টেম-লস হবে তিনদিন। ওরা উঠে পড়লো, আমরা ওভার ফ্লাই করবো। টু ডেজ ফর ট্যুর থ্রি ডেজ ফর ভিসা...। ওরা ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে হাসাহাসি করে চলে গেল।

দৃশ্যপট ২ : ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সারারাত জার্নি করে কক্সবাজারে সকালে পৌঁছেছে ২০/২৫ জনের একটি দল। ঢাকা থেকে এক মাস আগেই তারা বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল লাবনী বুকিং দিয়েছিলেন। চারতলা বিশিষ্ট মোটেল লাবনীর চারতলার রুমের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যায়। এজন্যই দলটি চারতলার ১২টি রুম আগেই বুকিং দিয়েছিলো। সকালে তারা লাবনী পৌঁছে দেখলো চারতলায় তাদের জন্য মাত্র দুটি রুম রয়েছে। বাকিগুলো অন্য লোকদের ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুরু হলো বাক-বিতন্ডা। এক মাস আগে অগ্রিম টাকা দেয়া হয়েছে। তাই দলের লোকজন চারতলার রুম খালি করে দিতে বলছে। অন্যদিকে লাবনীর কর্মচারীরা বলছে তাদের কিছুই করার নেই। পর্যটন কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশেই তারা চারতলার রুমগুলো অন্যদের ভাড়া দিয়েছে। বেড়াতে এসে শুরুতেই হয়রানির মুখোমুখি হলো মানুষগুলো।

এদেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকারি পর্যায়ে কাজ করছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন। কিন্তু তাদের বর্তমানে সেবার চিত্র উপরের ঘটনার চেয়ে আরো ভয়াবহ। দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু হোটেল, মোটেল তৈরিই যেন তাদের কাজ। পর্যটকদের সেবার মান দিন দিন নিম্নগামী হচ্ছে এসব হোটেল, মোটেলগুলো। তাই দেশী বিদেশী পর্যটকরা এদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। কক্সবাজারে অবস্থিত পর্যটন কর্পোরেশনের প্রবাল ও উপল নামের দুটি মোটেলকে বেসরকারি খাতে লিজ দেয়া হয়েছে। এখন কিন্তু ঠিকই ঐ দুটি মোটেল লাভের মুখ দেখেছে। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পর্যটন কর্পোরেশনের প্রায় প্রতিটি মোটেল প্রতি বছর বহু টাকা লস গুনছে। এ হচ্ছে এদেশের সরকারি পর্যায়ে পর্যটকদের সাহায্যে নিয়োজিত সংস্থার অবস্থা।

এ ছাড়া এদেশের মানুষের মানসিকতাও এদেশে পর্যটন শিল্প উন্নয়নে এক বড় অন্তরায়। বিদেশীদের দেখলে হা করে তাকিয়ে থাকা, গায়ে পড়ে কথা বলতে যাওয়া, বিষয়গুলো যেন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব শ্রেণীই আমরা এ আচরণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। কোনো দেশ বা স্থান ঘুরতে এলে পর্যটক চায় সে তার নিজের মতো ঘুরতে। কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে সাহায্য করতে যাই। যা বিদেশী পর্যটকদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে পাখি বিশেষজ্ঞ ইনাম-আল-হক সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'নড়াইলের জেলেরা উদ বিড়াল দিয়ে কিভাবে মাছ ধরে বিষয়টি জানার জন্যে কিছুদিন আগে ইউরোপ থেকে এসেছিলেন এক উদবিড়াল গবেষক। তিনি নড়াইলে দু'দিন থেকে ঢাকা চলে এলেন। দেশে ফিরে যাবার সময় বললেন, আমি উদবিড়াল নিয়ে কোনো কাজ করতে পারিনি। কারণ গ্রামের যেখানেই যাই, হাজার হাজার চোখ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।' একদল ট্যুরিস্ট ঢাকা এয়ারপোর্টে নামে। পরনে সর্টস। এখানের হোস্ট তাদের বলে দিলো শর্টস পরা চলবে না। ওরা আপত্তি করলো না। কিন্তু ওরা দেখলো সুন্দরবনের বোট ট্রিপ ছাড়া কোথাও প্রাইভেসি বলে কিছু নেই।

পর্যটন শিল্পে এদেশের বন্য প্রাণীগুলো একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু আমাদের হীন মানসিকতার জন্য এদেশের বন্য প্রাণীগুলো আজ বিলুপ্তির পথে। বন্য প্রাণী হাতের কাছে পেলেই পিটিয়ে মেরে ফেলতে হবে এ ধরনের একটা মনোভাব আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে আছে। এ থেকে আমরা

এখনও বেরুতে পারছি না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বন্য হাতি, বাঘ প্রায়ই লোকালয়ে চলে আসে। গ্রামবাসিরা ঢাক, ঢোল পিটিয়ে বন্য পশুদের বনে তাড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু আমরা ধরে ধরে মেরে ফেরি। ফলে দিনে দিনে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের বন্য প্রাণী। অন্যদিকে বেপরোয়াভাবে বন ধ্বংসের ফলে এমনিতেই বিলুপ্ত হচ্ছে এদেশের বন্য প্রাণী। গাছ কেটে জালানি হচ্ছে।

বাংলাদেশের পর্যটন বর্তমানে কিছু পাহাড়, আর সমুদ্র দর্শনের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমন- একজন পর্যটক যদি কক্সবাজার অথবা কুয়াকাটা বেড়াতে যায়, তবে সমুদ্রে গোসল করা ছাড়া তার বিনোদনের আর কোনো সুযোগ নেই। বিদেশীদের জন্য কক্সবাজারে এখনও একটি বার স্থাপন করতে পারেনি সরকারি বা বেসরকারি পর্যায় থেকে। কক্সবাজারে একটি ভালো বাজার নেই যেখানে পাওয়া যায় এদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী পণ্য সামগ্রী। নেই কোনো মানসম্পন্ন সিনেমা হল যেখানে বড় পর্দায় দর্শকরা উপভোগ করতে পারবে সন্ধ্যায় দেশী-বিদেশী সিনেমা। আর সবচে ভয়াবহ হলো নিরাপত্তার বিষয়টিতে। এদেশের পর্যটন স্পট যেসব জেলায় রয়েছে সেখানেই পর্যটকরা সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কক্সবাজারের বিচে বেড়াতে এসে পেটের সন্তানকে হারাতে হয়েছে এক ইরানি মহিলার। মাস্তানরা লাথি মেরে ঐ গর্ভবতী মহিলার পেটে বাড়ন্ত সন্তানকে মেরে ফেলে। সেই ঘটনার আজ পর্যন্তও বিচার হয়নি। আশির দশকে রাজশাহীতে হত্যা করা হয় এক বিদেশিনীকে বলাৎকারের পর। দেশের পার্বত্য জেলাগুলোতে এখনও বিরাজ করছে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি। দিনের বেলায় জেলাগুলোর বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে ট্যুরিস্টদের রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। আর রাত হলে তো কথাই নেই। রাতে হোটেলের বাইরে পা দেয়া মানেই বিপদ।

পৃথিবীতে সৌদি আরব ছাড়া প্রতিটি মুসলিম দেশে পর্যটনকে উৎসাহিত করা হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার পাশের দেশ মালয়েশিয়ার প্রধান উপার্জন হলো পর্যটন শিল্প। এদেশে পর্যটনের বাধা হলো মাস্তান মোল্লা ও পুলিশ। পুলিশের অযোগ্যতায় আঞ্চলিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হয় মাস্তান ও মোল্লাদের ফতোয়ায়। সেখানে এদেশের মানুষই ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সেখানে বিদেশী আসবে কি করে। অথচ আজকে যে আলোচনা হলো তাতে দেখা যায় বাংলাদেশের যা আছে তাই নিয়ে গড়ে উঠতে পারে বড় ধরনের পর্যটন শিল্প। কিছু প্রাইভেট কোম্পানি মাস্তানদের এড়িয়ে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যায় বিদেশীদের। এ ধারা বেশ সফল। পুলিশ বা যে কোনোভাবে সরকার শান্তি শৃঙ্খলা ফেরত আনলে প্রাইভেট সেক্টরেই এ শিল্প গড়ে উঠতে পারতো। সরকার সেখানে বিল্ডিং নির্মাণকেই শুধু দায়িত্ব মনে করছে। আমাদের ঐতিহ্য প্রাকৃতিক জলভূমি গোত্রীয় সংস্কৃতিকে নিয়ে কোনো প্রচার নেই। অথচ ইন্দোনেশিয়া রাম সীতার উপাখ্যানের প্রচার করছে নিজস্ব ঐতিহ্য বলে। মালয়েশিয়া বিপুল ছাড় দিচ্ছে তাদের এয়ার লাইনের মূল্যে বর্তমানের পর্যটন সংকট এড়াতে। নামমাত্র টিকেটে দেশ বিদেশ থেকে পর্যটক নিয়ে আসছে মালয়েশিয়া। ছাড় দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ডের এয়ার-লাইন। অভিনব প্রচার পদ্ধতি চালিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বিভিন্ন ফিল্ম ইউনিটকে দাওয়াত দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং করার জন্য। অনেক বিষয়ে ছাড় পাচ্ছে। এ ছবি যখন রিলিজ হচ্ছে তখন অস্ট্রেলিয়ার জীবনাচার বা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে ট্যুরিস্টরা আকর্ষিত হচ্ছে। সেখানে আমরা কক্সবাজার সৈকতের পুরনো এক ছবি বা ঢাকার তারা মসজিদ দিয়েই শুধু ট্যুরিস্ট আনতে চাইছি। এটা সম্ভব নয়। সব কিছুর জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে মেধার। প্রয়োজন আছে সৃষ্টি চিন্তার।

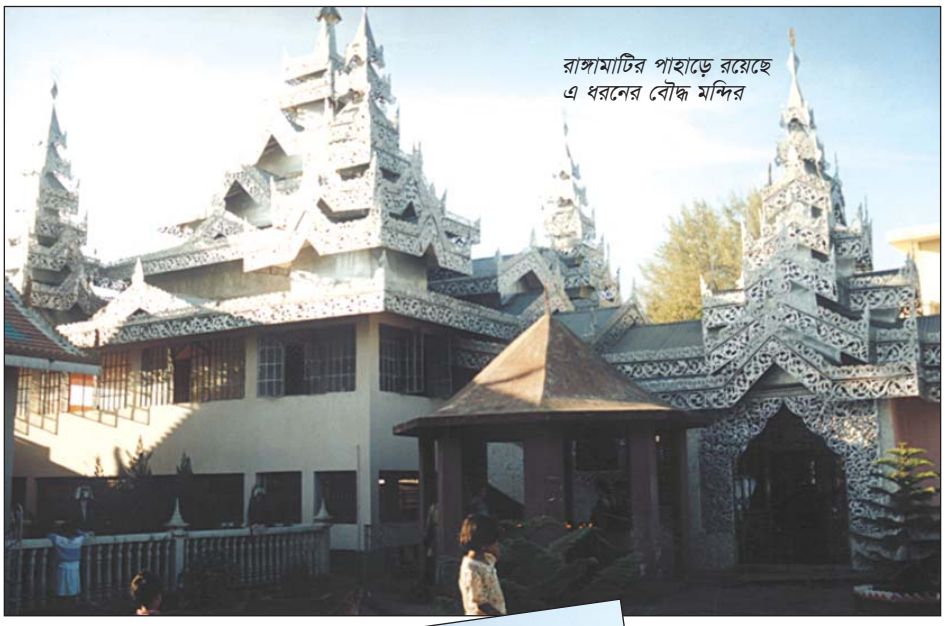

রাঙ্গামাটির পাহাড়ে রয়েছে এ ধরনের বৌদ্ধ মন্দির

পাখি দর্শনের প্রতিও এদেশবাসীর আগ্রহ বাড়ছে

সহযোগিতায় : **ইনাম আল হক** (পাখি বিশেষজ্ঞ), **মোঃ সাজ্জাদুজ্জামান** (সহকারী বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ বন বিভাগ),
লিয়াকত হোসেন খোকন
ছবি : **ইনাম আল হক**
আনোয়ার মজুমদার